আলোক
মালা
১

A Picture-Book for Class I of all Primary Schools of West Bengal.

আলোক-মালা

প্রথম ভাগ

[প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. টি.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ,

এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

মূল্য—

আলোক-মালা

প্রথম ভাগ

স্বরবর্ণ

ঋ ঋষি

৯

এ একতারা

ঐ ঐরাবত

ও ওল

ঔ ঔষধ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ঝ
ঝাউ
ঞ
মিঞ
ট
টিয়া
ঠ
ঠাকুরদাদা
ড
ডালিম
ঢ
ঢাক
ণ
বাণ
ত
তালা

থ
থলে
দ
দোয়াত
ধ
ধনুক
ন
নৌকা
প
পুতুল
ফ
ফড়িং
ব
বক
ভ
ভোমরা

ম
মোরগ
য
যব
র
রথ
ল
লাটিম
ব
বাঘ
শ
শকুন
ষ
ষাঁড়
স
সিংহ

হ
হনুমান
ড়
হাড়ী
ঢ়
আষাঢ়
য়
ময়না
ৎ
কাৎলা
ং
হংস
ঃ
দুঃখী
ঁ
পেঁচা

অক্ষর গঠন-প্রণালী

ব র ক ধ ঝ দ

ড ড় ঙ জ উ ঊ

য য় ষ ফ ঘ ম

ত অ আ ভ ও ঔ

হ ই ঈ এ ঐ ঞ

ঢ ঢ় ট চ ছ ঠ

ন ল ণ শ গ প

স ঌ ৎ ং ঃ ঁ

থ থ খ

শব্দ-গঠন

ব র ক ধ ঝ দ

বর

বক

রব   কর

দর   ধর

কদর কর।

বক ধর।

কবর   দরদ   ঝরঝর   ধবধব

ত ভ অ আ আ—া কা

কাক কাকা

ভাত আর

আতর আদর
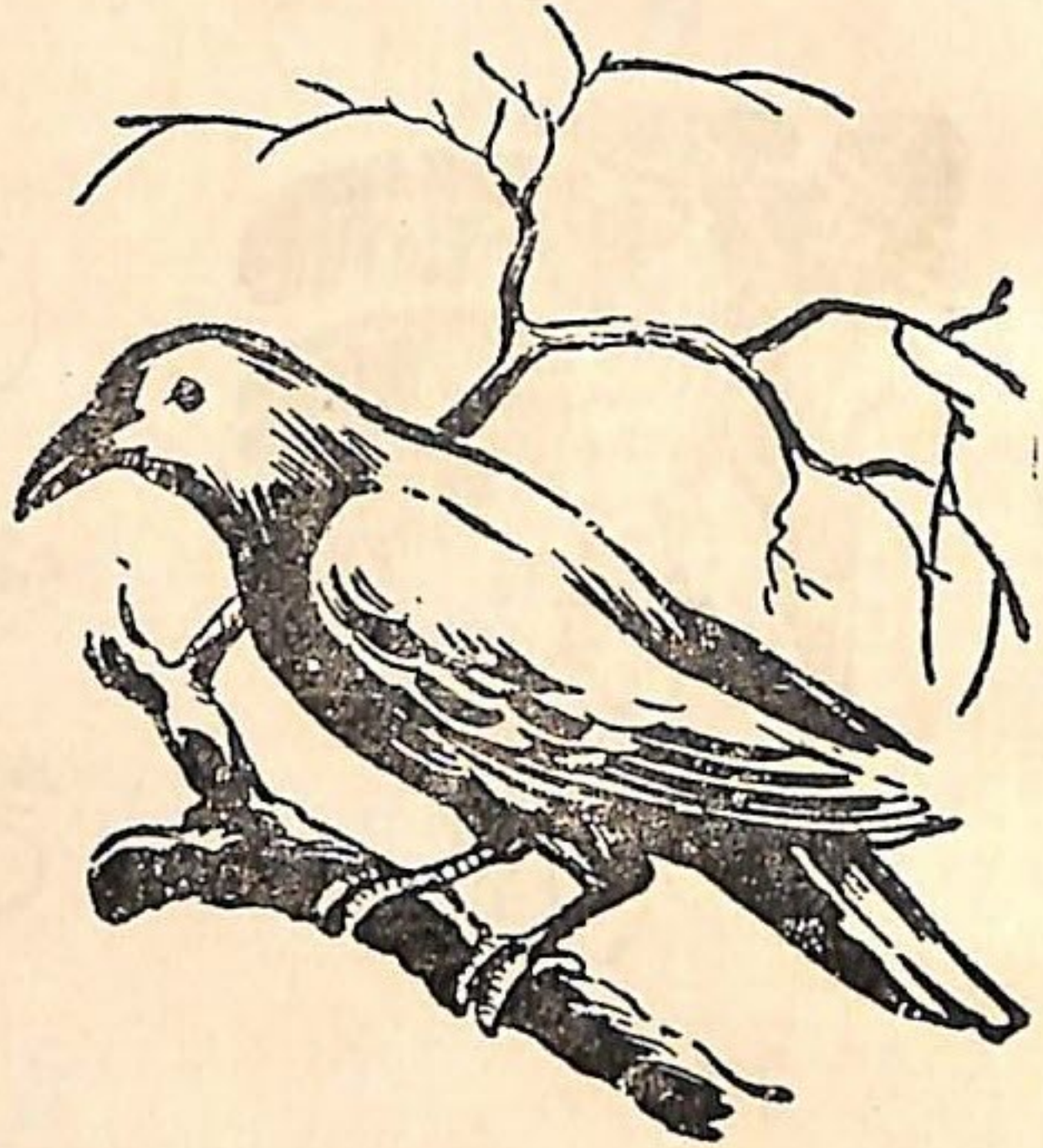
আতা আভা

অধর ভরত

ভারত

আতা আর কাক।
কত রাত।
কত তারা।
অত ভাত কার?

দাদা বাবা

কাদা আদা

ভার ধার

দাতা আবার বারবার

আদর কর।
দাদা আর বাবা।
ভাত আর অধর।
কত কাক আর বক।
আদা আর আতা ধর।
দাদা, আতার দর কত ?
ঝকঝক তকতক।

ই ই ঈ

বই কই

দই ঈদ

ইতর হইত

বাহার তাহার

হার

হাত ভাই

তাইতাই

ই—ি
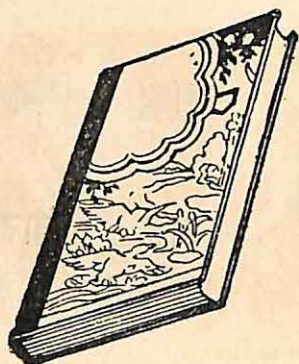
কার কবি দধি দিব

কি করি ? হিত কর। কি ধরি ? হাত ধর।

ধিক বিধি অবধি ঝিরঝির

কি বার ?

রবিবার।

দই কই ?

তরকারি দিব কি ?

ঈ—ী ভী

ভীত ধীর

কত তীর ! ভীত হই। ভরত কত ধীর।
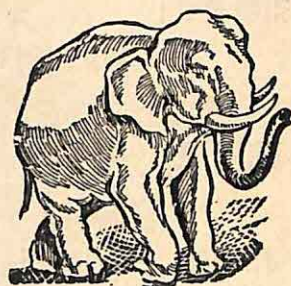
বীর ধীবর হাতী

হাতী কার ? রবি দাদার। হীরার হার।

ড ড় ঙ জ উ ঊ

ডর ডাব জবা

রঙ রাঙা বাজ

জড় বড় বউ

ঊহা তাজ কাজ

রাঙা জবা। রঙ কর। রাঙা রঙ।
বীর রাজা। ভিজা হাত।

ডাকাত হাঙর

বাজার জাহাজ
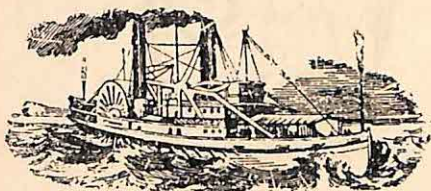
বড় বাড়ী। কাহার বাড়ী ?
ইহা বড় জাহাজ। বড় বড় হাঙর।

উ— ু কু রু হু

জুতা তবু তরু

রুই ভুরু দুধ

কুকুর বারুদ দুরুদুরু

আজ বুধবার। হরির কুকুর। বহু জাহাজ। দুরুদুরু বুক।

ঝুড়ি ঝুড়ি রুই।

ডাব কুড়ি দুই।

উ— ূ দূ

বধূ

দূত দূর

ঊরু

বড় দূর। বর বধূ।

বধূর হার।

য য় ষ ফ ঘ ম
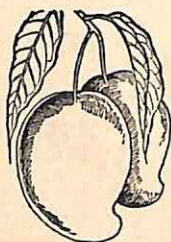
ঘর আম মই

মজা জাম ঘাম মাঘ

বাঘ বিষ ঊষা ভয়

মার ঘর।

আমি যাই।

বায়ু বয়।

ঘুম হয়।

বাড়ী যাব।

বড় ভয়।

ভয় দূর কর। ঊষার আভা। আয় হরি, ঘুড়ি উড়াই।

ঘড়ি ঘুঘু

মধু

ময়ূর মধুর

ডুমুর
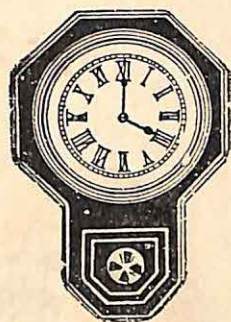
ধূম দূত ঘুম জমি

কুমীর মুড়ি মুড়কি ঘুঙুর

ধুতুরা বুড়ী বিধু কড়াই

দাম কত? কম দাম।

কার অত ডুমুর? হরির ডুমুর।

ঘুঘুর ডাক। ধুতুরার বিষ। রাধার ঘুঙুর। ভারি ধুমধাম।

আমরা ফড়িঙ ধরি। হরদম ঝমঝম।

মহিষ যায় বাড়ী। ঝরঝর বরষা।

ফুরফুর বায়ু বয়। বুড়ী যায় বাড়ী।

তাই বড় ধুম হয়। করি তাড়াতাড়ি।

থ খ ঋ ঋ— ৃ ঘৃ

ঋষি ঋতু

মুখ মাথা

থরথর

ঘৃত মৃত

অমৃত ঋজু

আজ রথ। রাথ খাতা। খই আর দই খাই। বড় বড় থাম।

কত বড় থাবা। ষড় ঋতু। থাম ভাই, খাবার খাই।

খবর কি ?

আমরা আখ খাব।

বৃষ খড় খায়।

আমরা মুড়ি মুড়কি খাই।

এ ঐ ঞ
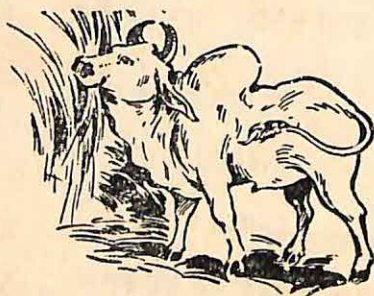
এ—ে

দে
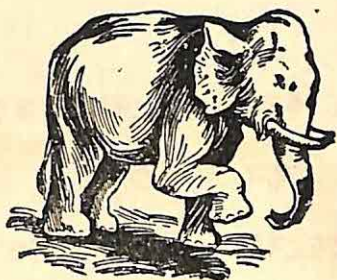
বড় মিঞা। ঐ ঐরাবত দেখ।

বহু দূরে এক বাঘ থাকে।

খুকু যায় ধীরে ধীরে।

ঐ—ৈ

দৈ

দৈব

হৈ হৈ

ভৈরব তৈয়ারি হৈমবতী

বাঘা করে ঘেউ ঘেউ। আমরা করি হৈ হৈ।

বেলা যায়। হৈমবতী দৈ তৈয়ারি করে।

ও ঔ ও—ো ক ো—কো

ও কি কর ? কোথা যাও ?

আম থোকা থোকা।

বড় রোদ। দোর দাও।

তোমার দোয়াত কই ?

তোমরা ঔষধ খাও।

হায় রে ঝকমারি !

বোঝা যে বড়ই ভারী।

ঔ—ৌ দ ৌ—দৌ ব ৌ—বৌ

দৌড় বৌদিদি

ধামা ভরে মৌরি রাখি। দৌড় দিয়ে যাও।

ডাক দেয় ও ঔ,

ভাত দাও বড় বৌ।

ঢ ঢ় ট ঠ চ ছ

মাছ মাঠ ঢাক

ঢেউ টাকা টিয়া

কৌটা চোর চড়াই

মৌমাছি আষাঢ় টিকটিকি

কোটা ভরা আছে মিঠাই। খুকু করে খাই খাই।
টোকা মাথায় কৃষক যায়।
ঢাকী দাদা ঢাক বাজায়।
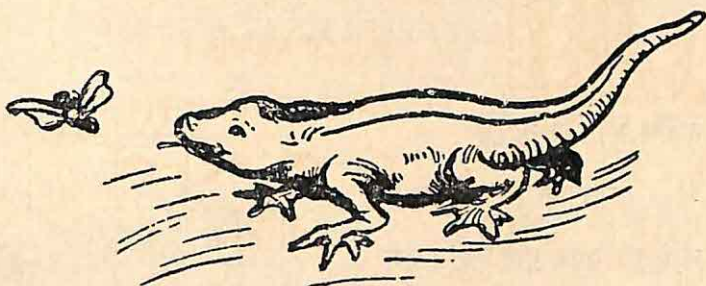
মেঝের মাঝে টিকটিকিটি,
দেখছে কাছের ঐ মাছিটি।

ণ ন ল শ গ প স
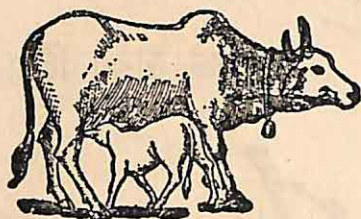
শ ু শু

গ ু গু

র ু রু

পশু শুশুক গুরু

লঘু শুভ শূল

সাপ সরু গরু রূপ রূপা

কলম ধর। পায়ে খড়ম পর। সাপ বড় খল। গরু উপকারী পশু।

নূতন কাপড় পর। শশধর বড়ই কৃপণ। রূপবান যুবক।

রূপার রঙ সাদা। কলম আছে খাতা নাই।

নদীর ঘাটের কাছে

নৌকোখানা আছে।

নাইতে যখন যাই দেখি সে

জলের ঢেউয়ে নাচে।

ঃ ৺ ং ৎ ৯
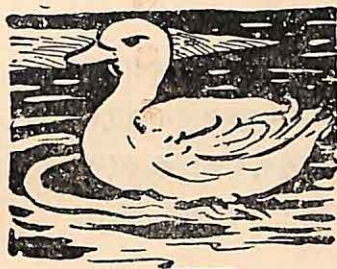
হাঁস বাঁশ কাৎলা চাঁদ

সিংহ মাংস খায়।
হাঁস সাঁতার দেয়।
উঃ! খুকুর কি দুঃখ!
সে তার খেলার হাঁড়িটি ভেঙে ফেলেছে।
অসৎও মহৎ হয় সাধু সহবাসে।
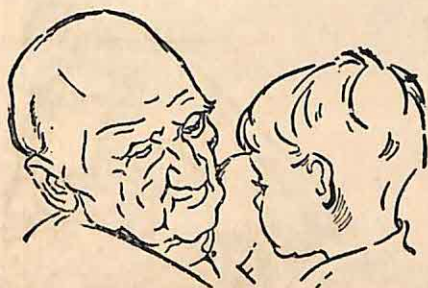
কাৎলা মাছের মুড়ো,

খেয়ে হলাম বুড়ো।

খোকন খায় লেজা,

ঠিক হবে সে রাজা।

খোকা গেছে কোন্‌খানে ?
শাল-পিয়ালের বন পানে।
সেখানে খোকা কি করে ?
থোকা থোকা ফুল পাড়ে।

গড়গড়ের মা লো—
তোর গড়গড়াটা কই ?
হালের গরু বাঘে খেয়েছে,
পিঁপড়ে টানে মই।

নীল সাগরের নীচে

সাগরের জলে মাছ আছে বহু রকমের। তাদের ভিতর অনেক মাছ আবার শিকারী। ওই যে মাছটা—করাতের মত সূচাল মুখ, এটি শিকারী মাছ। এ জাতের মাছেরা, বিশাল যে তিমি মাছ, তারও পেট চিরে দেয়।

সাগরতলের তরবারি মাছও বড় ভীষণ! এদের মাথায় সরু বর্শার মত একটা ধারাল কাঁটা আছে। তাই দিয়ে এরা জলতলের বড় বড় মাছকে ঘায়েল করতে পারে।

অক্টোপাস সাগরজলের আর এক ভীষণ জীব! এদের আছে আটটি বড় বড় শুঁড়। জলের তলার মাছকে এরা ওই শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে। তারপর তাকে পিষে মেরে খেয়ে ফেলে।

সাগরতলে আর এক রকম মাছ আছে। তাদের চোখ নেই। কেবল দেহ আর মাথা থেকে চকচকে এক রকম আলো বার হতে থাকে। সেই আলো দেখে নানা রকম মাছ এদের কাছে এসে জোটে। তখন আর কি? এই আলোধারী মাছগুলোর আহারটি হয় বেশ পরিপাটি রকমের।

ছড়া
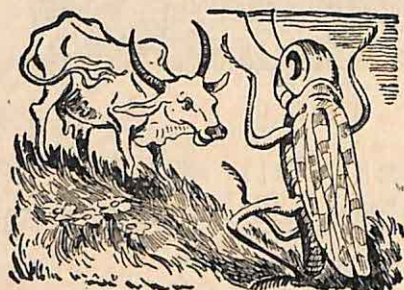
গান ধরেছে বনের ফড়িং,
নাচে তিড়িং তিড়িং;
তাই-না দেখে গরুটি ঐ
নাড়ায় তাহার শিং।

আষাঢ় মাসে রথের মেলা,

পৌষ মাসে পিঠে।

বছর শেষে গাজনের ঢাক

লাগে বড়ই মিঠে॥

বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপুরে ?
আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা !
যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নোখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্ ফাঁস্, মারে নাকো ঢুঁশ্ ঢাঁশ্,
নেই কোন উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত।

—সুকুমার রায়

গাছের কাঁটার কাজ

গরু-ঘোড়ার কাছে যাও—হয় তাহারা শিং দিয়া গুঁতাইয়া দিবে, নয়ত লাথি মারিবে। হরিণ দৌড়িয়া পলাইবে। সাপের কাছে মানুষ যায় না,—তাহার বিষের ভয়ে। মৌমাছি-বোলতার কাছে যায় না,—তাহাদের হুলের ভয়ে। বাঘ, সিংহ, ভালুক, কুমীরের আছে ধারাল দাঁত আর নখ। তাই মানুষ উহাদের কাছ হইতেও দূরে দূরেই থাকে।

গাছেদের কি আছে? কিসের জোরে উহারা টিকিয়া থাকে?

কাঁটা হইতেছে গাছের টিকিয়া থাকার সবচেয়ে বড় উপায়। এত সাধের যে গোলাপ,—কাঁটার ভয়ে টপ্ করিয়া তোমরা উহা গাছ হইতে ছিঁড়িতে পার না। খেজুরের কাঁটার ভয়ে শীতকালে খেজুর-রস খাইবার লোভ অনেককেই ছাড়িতে হয়।

তুমি একটি শখের বাগান করিয়াছ। অথচ গরু-ছাগলের বড় উৎপাত। বাব্‌লা বা ফণী মনসা গাছ দিয়া বেড়া দাও। তোমার বাগান বাঁচিয়া যাইবে।
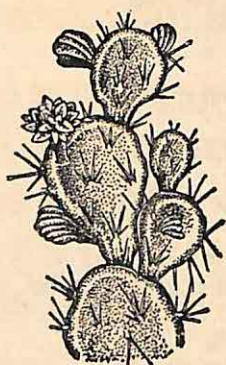
কাঁটাগাছ—ফণী মনসা

কথায় বলে—'ছাগলে কি না খায়!' এমন যে ছাগল, সেও কাঁটাগাছ ছোঁয় না। শিয়ালকাঁটা গাছের কাঁটার ভয়ে শিয়াল ত' দূরের কথা, মানুষও তাহার কাছে যায় না।

পিঠে খাওয়ার বায়না

দুলালের বায়নার আর শেষ নাই। কথায় কথায় তাহার বায়না। কবে পৌষ মাসে তাহার মা তাহাকে পিঠে গড়িয়া দিয়াছিলেন, সে পিঠে খাইয়াছিল। একদিন রাতে ঘুম ভাঙিয়া সেই পিঠের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আর যায় কোথায়! দুলাল অমনি বায়না ধরিল,—আমি পিঠে খাব। অঁা-অঁা-অঁা!

তাহার মা তাহাকে কত বুঝাইলেন,—বলিলেন, রাতের বেলা পিঠে কোথায় পাব! কাল দিনের বেলা পিঠে তৈরি করে দেব।

দুলাল সে-কথা কানেও তুলিল না। তাহার বায়নাও থামিল না। সে কাঁদিতে লাগিল,—অঁা-অঁা-অঁা!

মা তখন আর কি করেন! ময়দা মাখিয়া তাহার ভিতর গুড়ের পুর দিয়া ডেলা পাকাইয়া দুলালের হাতে দিলেন। বলিলেন,—এই নাও, পিঠে খাও!

বোকা ছেলে! উহাকেই দুলাল পিঠে মনে করিল। তাই সেটি হাতে লইয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর আবার সে বায়না ধরিল,—আমি রোদে বসে পিঠে খাব।

রাতে রোদ কোথায়! দুলালের মা পড়িলেন মহা ভাবনায় ভাবিয়া তিনি কূল-কিনারা পাইতেছেন না! ওদিকে দুলালের বায়নাও থামে না—আমি রোদে বসে পিঠে খাব—অঁা-অঁা-অঁা! মা আর কি করেন! একটা কাপড় টাঙাইয়া তাহার আড়ালে একটি জোরালো আলো রাখিয়া দিলেন। কাপড়ের ফাঁক দিয়া আলো দুলালের গায়ে-মুখে পড়িল। তাহাতেই দুলাল ভাবিল এই ত' রোদ উঠিয়াছে!

তখন সে খুশীমনে সেই আভাজা পিঠেগুলি গপ্‌গপ্‌ করিয়া খাইল। তাহার বায়নাও থামিয়া গেল।

ছড়া

আয়রে পাখী
লেজ-ঝোলা,
খেতে দেবো
দুধ-ছোলা।

হাঁড়ি-বুড়ী

এক বুড়ী তাহার মেয়ের বাড়ী চলিয়াছে। পথে বড় বাঘের ভয়। সারা পথ বুড়ী লাঠিতে ভর করিয়া বেশ ভালয় ভালয় গেল। মেয়ের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া একটা বনের পথ। সেই বনের পথে পা দিতেই একটা বাঘ বাহির হইয়া আসিল।

বাঘ দাঁত কড়মড় করিয়া চোখ পাকাইয়া বুড়ীকে বলিল,—বুড়ী আয়, তোকে খাই!

বুড়ী ভয় পাইল না। সে নরম সুরে বলিল,—এখন আমায় খেয়ো না, বাঘা মামা! মেয়ের বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে মোটা-সোটা হ'য়ে আসি, তখন খেয়ো। এখন শুকনো হাড় চিবিয়ে ত' সুখ পাবে না!
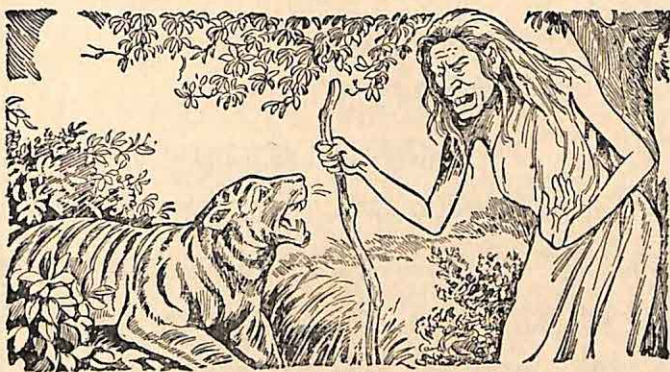
বাঘ ভাবিল,—তাই বটে ত'! তবে বুড়ী মেয়ের বাড়ী থেকে ফিরেই আসুক। বুড়ীকে বাঘ ছাড়িয়া দিল। বুড়ী তাহার মেয়ের বাড়ী গেল। বাঘ বনের ভিতর ঢুকিল।

এদিকে কবে বুড়ী ফেরে, বাঘ সেই আশায় দিন কাটায়।

মেয়ের বাড়ী হইতে ফিরিবার দিন বুড়ী মেয়েকে দিয়া একটা বড় নূতন হাঁড়ি কিনাইল। হাঁড়িটা লইয়া মেয়ের সঙ্গে সে বনের ধারে গেল। সেখানে বুড়ী সেই হাঁড়ির ভিতর বসিল। তারপর মেয়েকে একটা কাপড় দিয়া হাঁড়ির মুখটা বাঁধিয়া দিতে বলিল। হাঁড়ির মুখ বাঁধা হইলে বুড়ী মেয়েকে বলিল,—জোরে হাঁড়ির গায়ে একটা ঠেলা দে, বনের পথটা গড়গড়িয়ে পেরিয়ে যাই।

মেয়ে হাঁড়িতে ঠেলা দিয়া বাড়ী গেল। হাঁড়িটা গড়াইতে গড়াইতে বনের পথে আসিয়া ঠেকিল। বাঘটা সেখানে পথের পাশে বসিয়া ছিল। হাঁড়িটা দেখিয়া 'হালুম' করিয়া সে একটা ডাক ছাড়িল। সেই ডাকে সারা বনটা কাঁপিয়া উঠিল। বুড়ী যেমনি বাঘের ডাক শুনিল, অমনি বলিল,—

আমি হাঁড়ি পেটরোগা,
ঠেলা দেনা ওরে বাঘা!

হাঁড়ির ভিতর হইতে কথা বাহির হইতেছে দেখিয়া বাঘ ভাবিল, হাঁড়িই বুঝি কথা বলিতেছে! বুড়ী নয়! তাই সে হাঁড়িতে জোরে এক ঠেলা দিল। বুড়ী গড় গড় করিয়া বনের পথ পার হইয়া গেল। বাঘের আর বুড়ীর মাংস খাওয়া হইল না।

ভোর হলো

ভোর হলো দোর খোলো,
খোকাখুকু ওঠ রে।
পাখী ডাকে জুঁইশাখে,
ফুলকলি ফোটে রে।
নাই রাত, মুখ-হাত
ধোও শিশু জাগো রে।
জয়গানে ভগবানে
তুষি' বর মাগো রে।

—কাজী নজরুল ইসলাম

ভরতের কথা

সেকালে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল দশরথ। রাজার বয়স অনেক হইয়াছিল। তাই তিনি তাঁহার বড় ছেলে রামকে রাজা করিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন।

রাম বড়রাণীর ছেলে। মেজ ও ছোটরাণীর ছেলেদের চেয়ে তিনিই বড়। কাজেই রামকে রাজা করার কথায় সকলেই হইলেন মহাখুশী। কেবল কৈকেয়ীর এক কুঁজী দাসী ছিল। কথাটা তাহার ভাল লাগিল না। সে দেখিতে যেমন কুৎসিত, তেমনি হিংসুটে। রাম রাজা হইবেন,—এ কথা শুনিয়া সে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? সে তাড়াতাড়ি মেজরাণীর কাছে ছুটিয়া গেল। তারপর নানা কথায় মেজরাণী কৈকেয়ীর মন বিষাইয়া তুলিল। বলিল,—রাজা না একবার তোমাকে দু'টি বর দিতে চাহিয়াছিলেন? এই সুযোগ। এখন রাজার কাছে তোমার বর দু'টি চাহিয়া লও। এক বরে রাজা তোমার ছেলে ভরতকে রাজা করুন। অপর বরে রাজা দশরথ রামকে বনে পাঠান।

কুঁজী দাসীর কথামত মেজরাণী কৈকেয়ী দশরথের কাছে বর চাহিলেন। মেজরাণী কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাজা দশরথ হায় হায় করিতে লাগিলেন। বড় ছেলে রাম যে তাঁহার নয়নের মণি! তাহাকে তিনি বনে পাঠাইবেন কি করিয়া? মহা ভাবনায় মনের দুঃখে তিনি বিছানায় গা ঢালিয়া দিলেন।

ভরত তখন মামার বাড়ীতে ছিলেন। তিনি এ সবের কিছুই জানিতে পারিলেন না। একদিন রাম সকল কথা শুনিয়া বাপের মান রাখিতে মেজ-মায়ের কথায় বনে চলিয়া গেলেন। রামের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইল।

ভরত দেশে ফিরিয়াই রামের বনবাসের কথা জানিলেন। মনের দুঃখে ভাবিতে লাগিলেন—হায়, মা এ কি কাজ করিয়াছেন!
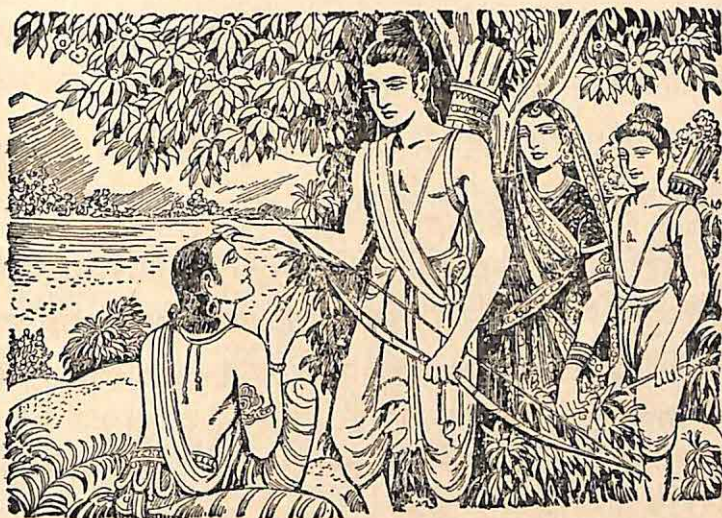
দাদা যে আমার জীবনের চেয়ে অধিক! তাঁহার সিংহাসনে আমি কি বসিতে পারি! তাছাড়া, দাদার শোকে বাবার যে মরণ হইল। হায়, তিনি ত' আর ফিরিবেন না!

ভরত অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া শেষে দাদাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। বহু দেশ পার হইয়া, বহু পথ হাঁটিয়া ভরত অবশেষে রামের দেখা পাইলেন।

রাম ও ভরতের মিলন হইল। ভরত রামের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিলেন,—দাদা, মায়ের কথায় তুমি বনে আসিয়াছ কেন? তুমি রাজধানীতে ফিরিয়া চল। তোমার সিংহাসনে তুমিই বসিবে।

রাম ভরতকে বুঝাইলেন যে, এখন তিনি রাজধানীতে ফিরিতে পারিবেন না। পিতা তাঁহাকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসে থাকিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন। চৌদ্দ বৎসর পরে তিনি রাজধানীতে ফিরিবেন।

রামকে কোনো রকমে ফিরাইতে না পারিয়া ভরত তাঁহার পায়ের খড়ম-জোড়া চাহিয়া লইলেন। বলিলেন,—যতদিন রাম না ফিরিবেন, ততদিন ঐ খড়ম-জোড়া সিংহাসনে রাখিয়া রামের নামে রাজত্ব চালাইবেন। ভরত রামের খড়ম মাথায় করিয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। বড় ভাইয়ের উপর ভরতের এই ভালবাসার তুলনা নাই।

খেয়ার মাঝি

মা, যদি হও রাজী,
বড় হ'লে হ'ব আমি
খেয়াঘাটের মাঝি।

বোকা কুমীর

[এক কুমীরের সহিত শিয়ালের দেখা]

শিয়াল। কেমন আছ, কুমীর ভায়া ?

কুমীর। ভালো নেই, ভাই! নদীতে মাছ কমে গেছে। না খেয়ে, না খেয়ে, শুকিয়ে গেলুম। তা শিয়াল ভায়া! তুমি কেমন আছ ?

শিয়াল। আমি ভাই, বেশ ভালই আছি। বনে ত' আজকাল আর খাবার পাওয়া যায় না। আমি তাই চাষবাস করছি। পেটপুরে খেয়েদেয়ে আছি বেশ আরামে !
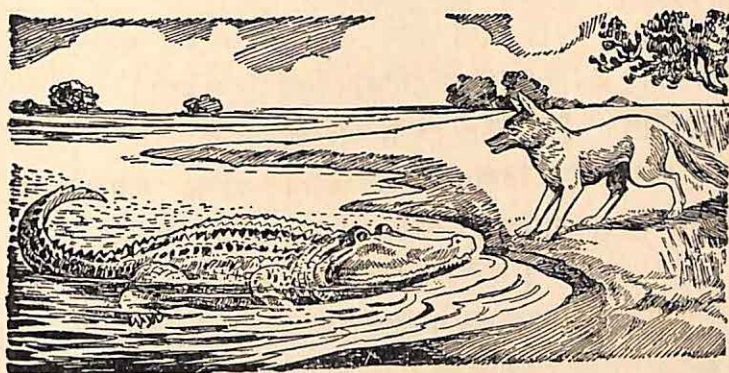
কুমীর। ভাই, আমাকেও নিয়ে চল না ! আমাতে তোমাতে চাষবাস করবো। তোমার খাটুনি কমবে। আধাআধি বখরা।

শিয়াল। বেশ ত' ! চল না আমরা আলুর চাষ করি।

কুমীর। তবে গাছের আগার দিক আমার। গোড়ার দিক তোমার।

শিয়াল। [হাসিয়া] বেশ, তাই হবে।

[যখন আলু হইল, কুমীর তখন সব গাছের আগা কাটিয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। শিয়াল মাটি খুঁড়িয়া আলুগাছের গোড়াগুলি লইয়া গেল।]

[কুমীর ও শিয়ালের দেখা]

কুমীর। ভাই, তুমি আমাকে বড় ঠকিয়েছ। আলুগাছে একটাও আলু পেলাম না।

শিয়াল। তা আমার দোষ কি ভাই! তুমিই ত' চেয়েছিলে গাছের আগা!

কুমীর। তা যাক্! এবার কিসের চাষ করছ?

শিয়াল। ধানের চাষ করব ঠিক করেছি।

কুমীর। ভাই, এবার আমি কিছুতেই গাছের আগার দিক নেব না। এবার আমাকে গোড়ার দিক দিতে হবে।

শিয়াল। [হাসিয়া] বেশ, তাই হবে।

[ধান হইলে শিয়াল গাছের আগা কাটিয়া লইয়া গেল। শিয়াল সব ধান পাইল। কুমীর শুধু খড়গুলি পাইল।]

[কুমীর ও শিয়ালের দেখা]

কুমীর। ভাই! তুমি এবারেও আমাকে ঠকিয়েছ। শুধু কতকগুলো খড় পেলাম আমি! ধান কই? আর আমি চাষ করতে যাব না। তুমি বড় ঠকাও।

[শিয়াল ও কুমীর দুইজনে দুইদিকে চলিয়া গেল।]

ছড়া

খোকা যাবে রথে চড়ে,
বেঙ হবে সারথি ;
মাটির পুতুল লটর-পটর,
পিঁপড়ে ধরে ছাতি।

খোকন খোকন করে মায়,
খোকন গেছে কার নায় ?
সাতটা কাকে দাঁড় বায়,
খোকন রে তুই ঘরে আয় !

জয়াবতী

জয়াবতীর যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। তাহা হইলে কি হইবে? তাহার বড় দুঃখ। তাহার মা নাই, আছেন বিমাতা। জয়াবতীর রূপ দেখিয়া তাহার বিমাতার বড় হিংসা।

একদিন জয়াবতীর বিমাতা জয়াবতীকে বনে পাঠাইয়া দিলেন। ভাবিলেন, বনের বাঘ-ভালুক জয়াবতীকে খাইয়া ফেলিবে। আপদ চুকিয়া যাইবে!

জয়াবতীর বাবা এ সবের কিছুই জানিতে পারিলেন না। বিমাতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জয়াবতী নদীতে বাসন মাজিতে গিয়াছিল। আর বাড়ী ফিরে নাই। বুঝি বা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা শুনিয়া জয়াবতীর বাবা বড়ই দুঃখ পাইলেন। আহা, মা-মরা মেয়েটি!

ওদিকে বনের ভিতর জয়াবতীর সহিত এক পরীর দেখা হইল। পরী তাহাকে আদর করিয়া তাহার দেশে লইয়া গেল। সেখানে বেশ সুখে জয়াবতীর দিন কাটিতে লাগিল।

জয়াবতী দিনে দিনে রূপের রাণী হইয়া উঠিল। এইবার পরী ভাবিল কোনও রূপবান রাজার ছেলের সহিত জয়াবতীর বিবাহ দিতে হইবে। তবে ত' তাহার বড় বাড়ী চাই, অনেক গহনাগাঁটি সাজপোশাক চাই, টাকাকড়ি চাই। তাই পরী তাহার জাদুকাঠি জয়াবতীর গায়ে ছোঁয়াইয়া দিল। অমনি জয়াবতীর সারা গায়ে সোনা ও হীরা-মণি-মাণিক্যের গহনা ঝলমল করিয়া

উঠিল। জরি-বসানো ঝকমকে শাড়িতে তাহার রূপ আরও বাড়িয়া গেল।

এবার পরী জয়াবতীকে লইয়া জয়াবতীর বাপের বাড়ী আসিল। পরীর হাতের সোনার কাঠির ছোঁওয়া লাগিতেই

তাহাদের কুঁড়েঘরের জায়গায় চক-মিলানো বড় বাড়ী, দাসদাসী, বাগান, পুকুর ও পেঁটরা-ভরা অনেক টাকাকড়ি হইল। জয়াবতীর বাবা রাজবাড়ীর মত ঘর-দুয়ার, টাকাকড়ি পাইয়া খুশী হইলেন। সব চেয়ে খুশী হইলেন হারানো মেয়ে জয়াবতীকে ফিরিয়া পাইয়া।

ইহার পর একদিন পরম রূপবান এক রাজকুমারের সহিত জয়াবতীর বিবাহ হইয়া গেল। জয়াবতীর বিমাতা হিংসায় পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন।

নারিকেলের বন

দূর সাগরের পারে, জলের ধারে ধারে,
নারিকেলের বনগুলি সব দাঁড়িয়ে সারে সারে।

চাষী ভাই

চাষী ভাই বড় ভাল,
চালায় লাঙল,
ফলায় মাটির বুকে
কতই ফসল।
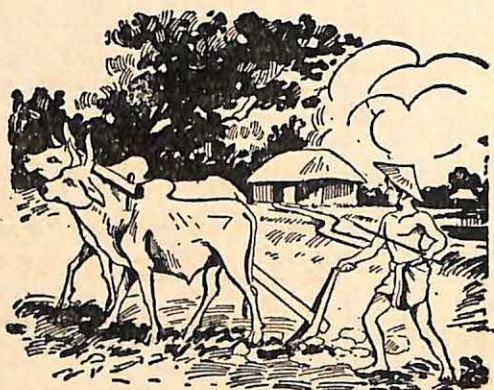
দোলন্ দোলায়

খুকুরাণী গাছের ডালে
দোলন্ দোলায় দুল্‌ছে।
কোঁক্‌ড়া কালো চুলগুলো তার
পিঠের ওপর ঝুল্‌ছে।
দুল্‌ছে খুকু ভোরের বেলা,
চারিধারে আলোর মেলা,
গাছের শাখে ঝাঁকে ঝাঁকে
পাখীরা তান তুল্‌ছে।

—সুনির্ম্মল বসু

বড় কে

আপনারে বড় বলে, বড় সে-ই নয়,
লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়।
গুণেতে হইলে বড়, বড় কয় সবে,
বড় যদি হ'তে চাও, ছোট হও তবে।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

এক আজব দেশে অমলা

সিঁড়ির পাশের ঘরটায় সব সময় তালা দেওয়া থাকে। অমলার মা অমলাকে বলিয়াছেন,—খবরদার! ওই ঘরটায় কোনদিন ঢুকো না যেন!

অমলার মা একদিন দুপুরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। অমলা সেই সুযোগে ঘরটার তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। তারপর দুম্ করিয়া ভিতর দিক হইতে খিল দিল।

দেখিল ঘরটা বেশ বড়। ঘরের ধারেই একটা পুকুর। পুকুরে কি-চমৎকার সব লাল-নীল মাছ!

সে এইসব দেখিতেছে, এমন সময় পুকুর-পাড়ের পথ দিয়া একটা টুপি-বুট-পরা খরগোশকে সে আসিতে দেখিল।

খরগোশের বগলে একগাছা লাঠি, চোখে চশমা। উহার একহাতে পাখা,—সেই পাখার বাতাস খাইতে খাইতে সে আসিতেছে।

কাছে আসিতেই খরগোশটার সহিত অমলা কথা কহিল। বলিল,—কোন্ দেশ থেকে আস্‌ছ ভাই?

অমলার কথা শুনিয়া খরগোশটা চমকিয়া উঠিল। তারপর হাতের পাখা আর লাঠি ফেলিয়া, দিল চোঁ-চা দৌড়।

অমলা উহার পাখাখানি লইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। ওমা, একি! যত বাতাস খায়, ততই যে অমলা ছোট হইয়া যায়! কি অদ্‌ভুত পাখারে বাবা! অমলা পাখাখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আর খানিক বাতাস খাইলে সে বোধ হয় মাটিতেই মিশিয়া যাইত!

এইবার অমলা পুকুরের একেবারে কিনারায় গেল—লাল মাছ দেখিতে। হঠাৎ তখন পা পিছলাইয়া সে জলে পড়িয়া গেল। জলে পড়িয়াই সে দেখিল,—একটা ইঁদুর সাঁতার কাটিতেছে। ইঁদুরটা তাহাকে বলিল,—আমার কাঁধ ধর। আমি তোমায় ওপারে নিয়ে যাব। দেখবে,—কেমন মজার দেশ আমাদের।

ইঁদুরটার কাঁধ ধরিয়া অমলা পুকুরের ওপারে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে হরেক রকমের পশু-পাখী। সবারই গায়ের পালক আর লোম সপ্‌সপে ভিজা। ভিজা জামাকাপড়ে শীতে অমলা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহা দেখিয়া ইঁদুরটা বলিল,—এস ফুঁ দিয়ে তোমার গায়ের জামা শুকিয়ে দিই। গাল ফুলাইয়া ইঁদুর কত ফুঁ দিল। অমলার জামা শুকাইল না।

তখন চশমা-পরা একটা পাখী বলিল,—এস খানিকটা দৌড়াদৌড়ি করা যাক। তাহলে গায়ের জল শুকাবে। এ কথায় খুব খানিকটা ছুটাছুটি তাহারা করিল। তবু জামাকাপড়ের কি গায়ের জল ত' শুকাইল না!

শেষ অবধি গায়ের জল গায়ে শুকাইয়াই অমলা বাড়ী ফিরিল। তখন রাত হইয়াছে। মা তাহাকে খোঁজাখুঁজি করিতেছিলেন। মেয়েকে ফিরিয়া পাইয়া তিনি মহাখুশী হইলেন। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন,—খবরদার! আর কখনো ওঘরে পা দিয়ো না যেন!

খেলা

লেখাপড়া হ'ল শেষ,
বাকী শুধু খেলা;
চল ভাই, খেলি গিয়া,
পড়িয়াছে বেলা।
মাঠে গিয়া ছুটাছুটি
খেলিব এখন,
শরীরে পাইব বল,
সুখী হবে মন।

—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য